১৫ই আগষ্টের কলঙ্ক—গণসংগ্রামের আঘাতে ঘুচাও

কংগ্রেসী রাজত্বের নাগপাশে জর্জ্জরিত জনতা

আজ থেকে চার বছর আগে '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের জনসাধারণ সবিস্ময়ে শুনল যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল। নেতারা বক্তৃতা দিলেন, কাগজে কাগজে ফলাও করে জানানো হোলো যে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও অপর দিকে লীগ নেতৃবৃন্দ আপোষের মারফৎ স্বাধীনতা এনে দিলেন। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণ মনে করেছিল যে তারা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য, বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্তি পাবার জন্য লাখে লাখে লোক হাসিমুখে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিয়েছে—যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে ভারতের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, সেই স্বাধীনতা বুঝি এসে গেল। তাই সেদিন ঘরে ঘরে পতাকা উঠল, রাস্তায় রাস্তায় আনন্দোজ্জ্বল মুখে স্বাধীনতা দিবস পালন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল ভারতের নর নারীরা সেদিন বামপন্থীদের অনেকেই একে স্বাধীনতা হিসাবে আখ্যা দিয়ে ছিলেন! কিন্তু আজ চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ভারতের জনসাধারণ বুঝেছে যে এ স্বাধীনতা নয়—স্বাধীনতার নামে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের এক বিরাট ষড়যন্ত্র। কিন্তু কেন এমন হোলো পরিস্কার ভাবে সেটাই বুঝতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ দু'শ বছর ধরে এদেশে শাসন ও শোষণ করছে। তারা দেখেছে ভারতে অপরযাপ্ত কাঁচামাল এবং সস্তায় মজুর পাওয়া যাবে—তাই তারা ছলে বলে কৌশলে ভারতের শাসন ক্ষমতাকে করায়ত্ত করেছিল। বৃটীশ তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাকে বজায় রেখেছিল, সামন্ত তান্ত্রিক প্রভুদের তৈরী করেছিল তাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যে। ভারতবর্ষে শিল্প তৈরীর কোন প্রচেষ্টাই করেনি। এই দু'শ বছরের শাসনে তাই কৃষক তাদের জমি হারিয়েছে, মজুর মধ্যবিত্ত পেয়েছে ছাঁটাই, অনশন, বুভুক্ষা।

তাই ভারতের গরীব জনসাধারণ বুঝেছিল যে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের উপর টিকে থাকতে মানুষের মত বাঁচার কোন সুবিধাই তাদের নেই। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাই ভারতের গরীব জনতা দিনের পর দিন সংগ্রাম করে এসেছে বৃটীশ শাসনকে এদেশ থেকে সরিয়ে দিয়ে "গণরাষ্ট্র" কায়েম করতে।

অপর দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী জন্ম লাভ করলো। তারাও দেখল ভারতে বিদেশী মূলধন টিঁকে থাকতে নিজেদের দুর্ব্বল পুঁজি নিয়ে ভারতের গরীব জনসাধারণকে শোষণ করার সুবিধা তাদের নেই তাই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদেরও একটা ভূমিকা ছিল। তাদের প্রচেষ্টা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসন সরাতে পারে তারা এদেশ শাসন ও শোষণ করার একচেটিয়া অধিকার পাবে। কিন্তু এই বিরোধীতা সংস্কারবাদী বিরোধীতা, বিপ্লবী নয়। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর কাছে দেশের জনতার চেয়ে বেশী আপনার লোক।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চ্চা হিসাবে তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ভারতের গরীব জনসাধারণের প্রতিনিধি বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি যেমন কাজ করতো অপরদিকে তেমনি ভারতীয় বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বও কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে পাঁয়তাড়া করে জনশক্তির চাপ দেখিয়ে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নেবার চেষ্টা করত। কতকগুলি অবস্থার ফলে কংগ্রেসের আদর্শগত নেতৃত্ব এই দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের হাতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

তাই দেখা যায়—ভারতের গরীব জনতা যখনই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিপ্লবী সংগ্রাম চালাতে গিয়েছে তখনই তাকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সহিংস আন্দোলনের অজুহাতে

(৩য় পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৪র্থ বর্ষ. ১ম সংখ্যা | বুধবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯৫১, ২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

আগামী নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রেসকনফারেন্স

কমরেড শিবদাস ঘোষের এস, ইউ, সি, আই-এর নির্ব্বাচনী ইস্তাহার বিশ্লেষণ।

৭ই আগষ্ট কলিকাতার মেট্রোপল হোটেলে তেরটি প্রেস প্রতিনিধিদের সম্মুখে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ আগামী নির্ব্বাচন সম্পর্কে এস, ইউ, সির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কংগ্রেসকে পরাজিত করাই জনসাধারণের প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু কংগ্রেসের পরিবর্ত্তে যদি কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দল যাহারাও পুঁজিপতিদের অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং তাহাদেরই স্বার্থের ধারক এবং বাহক, কিংবা হিন্দু মহাসভা, পিপল্‌স্ পার্টি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা দখল করে তাহা হইলেও জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বিন্দুমাত্র লাঘব করা সম্ভব হইবে না। তখন পুনরায় ইহাদেরই বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। সুতরাং কংগ্রেস ছাড়া এই সমস্ত দলগুলির বিরুদ্ধেও পার্টি লড়িবে। (যদি কোন বামপন্থী বলিয়া পরিচিত দল উপরোক্ত দলগুলির সহিত সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্চ্চাচনে ঐক্য গড়ে তবে ঐ সমস্ত বামপন্থী দলের সহিত এস, ইউ, সির সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না তবে অবস্থা বিশেষে স্থানীয় ঐক্য হইতে পারে। কমরেড ঘোষ আরও বলেন যে এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সর্ব্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়া প্রয়োজন এবং এস, ইউ, সি তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট। প্রশ্নোত্তরে তিনি সংযুক্ত সমাজবাদী সংস্থা সম্পর্কে বলেন যে ইহার ভিতরে যদি সমস্ত বামপন্থী দলগুলি একতা গড়িতে পারে তাহা হইলে তাহা সবচেয়ে শ্রেয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য কতগুলি দলের কার্য্য কলাপের জন্য এ সম্পর্কে বর্ত্তমানে সুনিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। তিনি আরও বলেন যে এস, ইউ, সি জনসাধারণকে এই ধাপ্পা কখনও দিতে চায় না যে, নির্ব্বাচনের মারফৎ জনসাধারণের সমস্ত মৌলিক সমস্যার সমাধান হইবে। মার্কসবাদী দল হিসাবে এস, ইউ, সি বার বার ঘোষণা করিয়াছে যে একমাত্র বিপ্লবের মারফতই জনতার সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু এক শ্রেণীর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য জনতার সত্যিকারের প্রতিনিধি পরিষদে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার জন্যই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নির্ব্বাচন মারফৎ এ বিষয়ে জনতাকে সঠিকভাবে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য কিছু বামপন্থী দলের নির্ব্বাচনের মারফৎ "গণ সরকার" প্রতিষ্ঠার চিন্তাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। বামপন্থীদের যুক্ত ফ্রন্টের অপরিহার্য্যতা ব্যখ্যা প্রসঙ্গে

(৩য় পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী বিপ্লবী দলের সভ্য হওয়ার যোগ্য হন

আমাদের দেশে মার্কসবাদী আন্দোলন নতুন নয়। মার্কসবাদী দল বলে পরিচয় দিয়ে চলেছে এমন দলের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। একথা আজ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সত্যিকারের মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়ে ওঠার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও কার্য্যক্রম একমাত্র "ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার" ছাড়া আর কোন দলই গ্রহণ করে চলেনি।

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দেশের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছে যে, দেশীয় ধনিক মালিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেস ও জমিদার এবং অনগ্রসর ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ লীগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে র‍্যাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়ার পর থেকেই আমাদের জাতীয় বিপ্লব (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) বিশ্বাসঘাতকতার মার খেয়ে অর্দ্ধপথে শেষ হয়ে গেছে। দেশীয় বড়লোক, জমিদার, মহাজনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর জাতীয় ধানিক শ্রেণীকে সরাসরি সংগ্রামে জনসাধারণের শত্রুপক্ষে টেনে নিয়েছে, শ্রেণীগতভাবে। ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেশের বৈপ্লবিক স্তর নির্ণয় করার ব্যাপারে এক মূলগত পরিবর্তন সাধন করেছে। জাতীয় বিপ্লবের অসমাপ্ত সংস্কারগুলি আজ আর জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর মারফৎ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ভারতের জাতীয় বিপ্লবের অসমাপ্ত সংস্কারগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর সাথে খাদ হ'য়ে মিশে গিয়েছে তাই, এস, ইউ, সি ঘোষণা করেছে যে, আমাদের বর্তমান বিপ্লবের স্তর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায়ে এসে পড়েছে জাতীয় বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচীগুলি যুক্ত করে নিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী শক্তি সমূহের কাছে তাই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য এস, ইউ, সি দৃঢ় কণ্ঠে আহ্বান করছে, প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী বিপ্লবী দল গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে। দ্বিতীয়তঃ মার্কসবাদী বলে পরিচিত পাঁচ মিশালী দলীয় গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে সত্যিকারের বিপ্লবীদল বেছে নিতে। তৃতীয়তঃ শ্রমিক শ্রেণীরদল নিচে নেওয়ার লক্ষণগুলি জনসাধারণের সামনে প্রতিনিয়তই তুলে ধরছে। চতুর্থতঃ সর্বহারা শ্রেণীর দলের মতবাদিক ভিত্তি মার্কসীয় জীবণ দর্শনের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার ও সাংগঠণিক বা গঠণতান্ত্রিক ভিত্তি গণতান্ত্রিকএকেন্দ্রীকরণ এর মূল আধার হিসাবে গ্রহণ করতে।

মার্কসীয় জীবণ দর্শনকে হাতিয়ার করে যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠছে এর সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও সার্থকতা একান্তভাবে নির্ভর করছে দুটি মূল উপাদানের উপর। প্রথম উপাদানটি হচ্ছে দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতির পরিপক্কতা। এ প্রসঙ্গে এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে দুনিয়া জোরা ধণবাদের সঙ্কট যে ভাবে দ্রুত গতিতে জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে তাতে করে ধণবাদের শেষ দিন আগত প্রায়। আমাদের দেশের রাষ্ট্র বা সমাজের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। জনসাধারণের কোন সমস্যা সমাধাণের ক্ষমতাই এ সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাখে না। তাই এক সমস্যা মিটানোর নামে অন্য আর একটি জটিল সমস্যা প্রতিনিয়ত সমাজের চার পাশে জমা হচ্ছে। এই জমাট সমস্যার চাপ সমাজ জীবনকে বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় ভরপুর করে তুলছে। দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে বৈপ্লবিক শক্তি বা শক্তি সমূহ।

বৈপ্লবিক শক্তি আজ অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী সজাগ, সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের এই ত্রুটি প্রত্যেকটি মেহন্নতী জনসাধাণকে আজ সর্বশক্তি নিয়োগ করে দূর করতেই হবে। এ জন্য যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত করা প্রয়োজন সে দায়িত্ব ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার নিদে এগিয়ে এসেছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তের আদর্শগত সংগ্রামে এস, ইউ, সি জনসাধারণকে সচেতন করার অবিরামসংগ্রাম পরিচালনায় আত্ম নিয়োগ করেছে। তাই এস, ইউ, সি'র সভ্য ভূক্ত হয়ে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শক্তিশালী করা এবং দেশের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মার্কসবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেক কর্মী, সংগঠক ও সাধারণ মানুষকে আহবাণ করেছে।

মার্কসবাদী বিপ্লবী দলের সভ্য হওয়ার যোগ্যতা বিপ্লবের কোষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়ার সে পদ্ধতি এস, ইউ, সি গ্রহণ করেছে তার মর্মকথা মূলতঃ এই রূপ :

* মার্কসবাদকে জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ।
* মার্কসবাদী দলের সভ্য হওয়ার বৈপ্লবিক গুরুত্ব কার্য্যতঃ অনুসরণ।
* শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি ও চেতনা।
* শ্রেণী তথা দলের শত্রু ও বিরোধীদের সম্বন্ধে দৃঢ়তা।
* প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা ও জনসাধারণকে মুক্ত করার যোগ্যতা।
* সমস্ত সমস্যার সমষ্টিগত সমাধান-প্রণালী আয়ত্ব ও অনুসরণ।
* বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি ধারার গুরুত্ব উপলব্ধি।
* গণ-তান্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা
* বৈপ্লবিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগীতার আৎপর্য্য অনুধাবন ও অনুসরণ।
* বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা।

মার্কসবাদী দলের সভ্য হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক কর্মীকেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা প্রত্যেক কর্মীকেই সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মারফৎ আয়ত্ব করে যোগ্য হতে যোগ্যতর হতে হবে। এই শিক্ষাই এস, ইল, সি'র শিক্ষা।

এই শিক্ষা নিয়ে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলে আজও বৈপ্লবিক শক্তি সমাবেশে ও প্রস্তুতির যে ত্রুটি রয়ে গেছে তা দূর করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সত্যিকারের মার্কসবাদী দল গড়া ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাস্তবে না সম্ভব হচ্ছে ততদিন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পরিপক্কতা নিয়ে আসুক না কেন বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব হবে না। তাই সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী, সত্যিকারের বা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রী; বিপ্লবী মার্কসবাদী দলের সভ্য হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে চলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবেনই।

সর্বশেষে মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবের মূল উৎস জনসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যে যে বৈপ্লবিক মনোভাব নিহীত রয়েছে—তা জাগ্রত করার উপরই নির্ভর করছে বিপ্লবীদের শক্তি সঞ্চয়। জনসাধারণের এই বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত করার অন্যতম উপায় দৈনন্দিন সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় জনতাকে শিক্ষিত করা, গণআন্দোলনে টেনে আনা। জনসাধারণের চেতনা সংগ্রামের মারফৎ যতই বাড়বে, ততই সচেতন হয়ে উঠবে জনসাধারণ। এই সচেতন জনতা গণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্ঘশক্তি গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসবেই। সচেতন, সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণের এই অগ্রগতিই তাঁদের টেনে আনবে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অগ্রদূতের ভূমিকায়। এই অগ্রদূতের দল নিজেদের সংখ্যা অফুরন্তভাবে বাড়িয়ে চলবে - যার তুলনায় কোন শাসক বা শোষক অধুনিক সজ্জার দাপটে দাবিয়ে রাখতে পারবে না—আগত বিপ্লবকে। যে বিপ্লব সুখী, স্বাধীন ও শ্রেণী হীণ সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ডি, এন্, ব্রাদার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

গত ২রা আগষ্ট সালকিয়া ডি, এন, ব্রাদার্স এর মজুরদের এক সাধারণ সভায় কারখানার মজুরদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য ডি, এন্ ব্রাদার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়। কারখানায় শতকরা ৯০ জন মজুর এই ইউনিয়নের মেম্বার হইয়া তাহাদের সংগঠনকে জোরদার করিয়াছেন। ঐ সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইউনিয়নের কাজ চালাইবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীনারায়ণ দাস—সভাপতি
শ্রীউৎপল রায়—সম্পাদক
শ্রীশিবচন্দ্র খামারু—সহ-সম্পাদক
শ্রীবলাই চাঁদ দাস—কোষাধক্ষ
শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী—সদস্য
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত— „
শ্রীরামগরীব দাসী— „

কমিটির হাতে নূতন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার উপর ট্রায়বুন্যালের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এই কারখানার শ্রমিকরা আইন গতভাবে ইহার অধিকাবী হওয়া সত্বে ও মালিকের অনমোনীয় মনোভাবের জন্য এ-যাবৎ সেই সিদ্ধান্তের কোন সুফলই শ্রমিকরা পাইতেছে না; সুতরাং ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য তৎপর হইয়াছেন।

কাশ্মীর বাসীই শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীন কাশ্মীর রচনা করবে

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি বন্ধ কর

ভারত-পাক যুদ্ধাতঙ্ক এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সম্পর্কে অধ্যাপক কে, পি চট্টোপাধ্যায় (ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি), জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় (ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড), সুবোধ ব্যানার্জী (সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার), বঙ্কিম মুখার্জী (কমিউনিষ্ট পার্টি), এস, হালদার (বলশেভিক পার্টি), রমেন্দ্র নাথ দে (বিপ্লবী সাধারণ তন্ত্রীদল), প্রদ্যোৎ দাস (সাম্যবাদী বামপন্থী সংহতি) প্রমোদ সেন গুপ্ত (কেন্দ্রীয় খাদ্য অভিযান. কমিটি); প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গোপাল বন্দোপাধ্যায়, (মনিরায় সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদ), ডাঃ নরেশ ব্যানার্জ্জী (পিপলস রিলিফ কমিটি), দেবতোষ দাশগুপ্ত (শান্তিসেনা), শান্তি দত্ত (ইউ, পি টি ডবলিউ), শ্যামা রায় (সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি), নরেন ঘোষ (ইষ্ট বেঙ্গল লিগাল এইড্ কমিটি), অরুণ দাশগুপ্ত (বি, পি, এস, এফ), কানাই ব্যানার্জ্জী (এ, আই আর, এল, ও), এবং আরো ১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এক সুদীর্ঘ যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বিবৃতির সারমর্ম্ম নিম্নরূপ :—

সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, কায়েমী স্বার্থের রক্ষক কংগ্রেস ও লীগ সরকার নিজ নিজ দেশে সরকার-বিরোধী মনোভাবের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়াই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া দেশের মধ্যে যুদ্ধ ও দাঙ্গার আবহাওয়া সৃষ্টির চাল চালিয়াছে।

ভারতীয় ইউনিয়নে নির্ব্বাচন সামনে; ইহাদ্বারা নির্ব্বাচন পিছাইয়া দেওয়া এবং জনগণের কংগ্রেস বিরূপতা জয় করার পরিকল্পনা ইহাতে নিহিত। পাকিস্তানেও বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় জনসাধারণ বুঝিয়াছেন যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কায়েমী স্বার্থের মুনাফা লাভের পথ ক'রে, আর জনসাধারণের জীবনধারনের মান যেমন নামে তেমনি তাঁহাদের জীবনও বলি হয়; আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে যাযাবর বাস্তহারা হইতে হয়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ জিয়াইয়া সেই সুযোগে কাশ্মীরে সোবিয়েৎ-বিরোধী যুদ্ধঘাটি গড়াও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। ইউ এন ও এবং গ্রাহাম উহারই প্রতিনিধি। কাজেই, যুদ্ধ ও দাঙ্গার পথে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারত-পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের সরকারই কায়েমী স্বার্থের রক্ষক এবং দেশের জনগণকে ভয় করে—কাজেই দুই-ই সাম্রাজ্য বাদ প্রভাবিত ইউ এন ও তে দরবার চালাইতেছে। আসলে কাশ্মীরবাসীর স্বাধীন মতামতে কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্দ্ধারণ করিলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এবং যুদ্ধাবস্থা ও সাম্প্রদায়িক রেষারেষিও কমিয়া উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষিত হইবে।

উপসংহার বিবৃতিতে জসসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে :—

(১) তাহারা নিজ নিজ সরকারের নিকট দাবী করুণ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে কাশ্মীর হইতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ দুর করিতে হইবে। কাশ্মীর প্রশ্ন ইউ, এন, ও হইতে তুলিয়া লইতে হইবে। কাশ্মীরবাসীদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাশ্মীরবাসীদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(২) গণ আন্দোলনের চাপে নিজ নিজ সরকারকে উপরোক্ত দাবি মানিতে বাধ্য করুন।

(৩) সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদিগকে যাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয় বা যুদ্ধাভাব ও সাম্প্রদায়িক মনবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এমন কিছু না প্রকাশ করিতে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রচার চালাইতে অনুরোধ করুন।

(৪) এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেই রাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যরাষ্ট্রের হাই কমিশনার মারফত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সরকারগুলিকে বাধ্য করুন।

(৫) প্রতিটি রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিবার সুযোগ দিবার ও তাহাদিগকে সকল রকম অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

(৬) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ ও প্রগতিশীল দল ও সংগঠনগুলি এই যুদ্ধ প্রচার ও প্রস্তুতিকে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিরোধ করিয়া, যুদ্ধকে অসম্ভব করিয়া তুলিবেন।

ঐক্যের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়া ২৯শে জুলাই উদ্‌যাপিত

কলিকাতার জনসভায় শ্রমিক নেতাদের ভাষণ

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই এর সারা ভারত ডাক্ ও তার কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সমর্থনে সংঘটিত ঐতিহাসিক দেশব্যাপী শ্রমিক কর্ম্মচারী ও ছাত্র ধর্ম্মঘটকে স্মরণ করে এ বছরেও ২৯শে জুলাই শ্রমিক ঐক্য দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়।

ইউ, টি, ইউ, সি ও বি, পি, টি, ইউ, সি যুক্তভাবে এই দিবস পালন করে; এই দুই সংগঠনের মিলিত উদ্যোগে ময়দানে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়। লালঝাণ্ডা উড়াইয়া ৭ হাজার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী দৃঢ়কণ্ঠে ঐক্যের আওয়াজ তুলিয়া এই সমাবেশে মিলিত হ'ন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউ, টি, ইউ, সির সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি বোস। সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে কংগ্রেসী সৈরাচারী সরকারের পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রমিক কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। আসন্ন নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে সত্যিকারের বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইলে নির্ব্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয় হইবে।

গণদাবীর প্রধান সম্পাদক ও বাংলার অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জি ২৯শে জুলাই এর ঐতিহাসিক শিক্ষাকে স্মরণ করাইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বর্ত্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য; কংগ্রেসী শাসণে সবচেয়ে বড় যে অভিজ্ঞতা শ্রমিক শ্রেণীর এবং দেশবাসীর হইয়াছে তাহা হইতেছে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের চক্রান্তের ফলে শ্রমিক ঐক্য দুর্ব্বল হওয়া এবং মালিক শ্রেণীর অবাধ শোষণের সুযোগ লাভ। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ঐক্য সম্বন্ধে কমরেড ব্যাণার্জ্জি বলেন যে ইউ টি, ইউ সি এবং এ, আই, টি, সি মধ্যে ঐক্য হওয়া প্রয়োজন এবং এই ঐক্যের পথ হিসাবে তিনি ঘোষণা করেন যে নীচু হইতে ঐক্য গড়িয়া উঠিবে এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সংগঠন সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে যুক্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিবে। ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হিসাবে বিভিন্ন কারখানায় ও অফিসে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের কোয়ার্ডিনেশন কমিটি গঠন করিবার কথা বলেন। হিন্দ্ মজদুর সভার দক্ষিণপন্থীর গণতান্ত্রিক সমাজবাদী নেতৃত্ব সম্বন্ধে কুসিয়ারী করিয়া তিনি বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের চর জয়প্রকাশী নেতৃত্ব শ্রমিক ঐক্য ব্যর্থ করিতেছে।

ইউ, টি, ইউ, সি নেতা কমরেড বিশ্বনাথ দুবে বলেন চীনের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া দেশকে চলিতে হইবে; তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন যে, সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে এক ঝাণ্ডার নীচে, এক সংগঠনে সমবেত হইতে হইবে। দেশকে প্রতি ক্রিয়ার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত বামপন্থীদলের ও সংগঠনের দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ মোর্চ্চা গঠন করিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা বঙ্কিম মুখার্জ্জি বলেন যে, ১৯৭৬ সালের ব্যাপক গণ আন্দোলনের অভ্যুত্থানকে সাম্রাজ্যবাদ আত্মঘাতী দাঙ্গায় ডুবাইয়া দিয়াছিল। আজ আবার সাম্রাজ্যবাদীরা নূতন যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হইলে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা যাইবে।

সভায় শ্রমিক ঐক্যের প্রতি বিশেষ জোর দিয়া এবং বামপন্থী দল ও সংগঠনের মিলিত মোর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন শ্রমিক নেতা যতীন চক্রবর্ত্তী, নেপাল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক হীরেণ মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

সভায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার চেষ্টার উপর জোর দিয়া বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক অশান্তির উপর এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। অন্য প্রস্তাবে শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়।

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কমরেড ঘোষ যে সমস্ত বামপন্থী দল সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্রীয় যুক্ত ফ্রন্টের পরিবর্ত্তে স্থানীয় যুক্ত ফ্রন্টের সুবিধাবাদীনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজ্য পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এস, ইউ, সির মনোনীত প্রার্থী আগামী নির্ব্বাচনে উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে এস, ইউ, সির সহিত কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর এস, পি প্রভৃতির পার্থক্য সম্পর্কে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তদুপরি অল্প সংখ্যক বিপ্লবী সংগঠকের চেষ্টায় এস, ইউ, সি যে ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর তথা জনসাধারণের সত্যিকারের বিপ্লবী দল হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধেও কমরেড ঘোষ সাংবাদিগদের আলোক দান করেন।

সারা ভারত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নির্বাচনী

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও বিভিন্ন রাজ্য আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আগামী নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে দেশব্যাপী সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বে। কংগ্রেসী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই সাধারণ নির্ব্বাচন হ'বে। কিন্তু একদিকে যেমন সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের গনতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি যত নির্ব্বাচন এগিয়ে আসছে স্বৈরাচারী কংগ্রেসী সরকারও তত বেশী সাধারণ মানুষের মৌলিক গনতান্ত্রিক অধিকার গুলি হরণ করছে; ব্যক্তি স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরছে। যে কোন নাগরিককে যে কোন সময়ে গ্রেপ্তার করার এবং বিনা বিচারে আটক রাখার আইন তৈরী হয়ে আছে। প্রিভেণ্টিভ ডিটেনসন এ্যাক্ট অনুযায়ী বহু রাজনৈতিক কর্ম্মী জেলে বন্দী আছে, মূল গঠনতন্ত্রের "মৌলিক অধিকার" অনুচ্ছেদের পরিবর্ত্তন এবং প্রেসের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার ফলে স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করার অধিকার নষ্ট হয়েছে, সভা শোভাযাত্রা এবং সংগঠনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সরকারের এ সব কার্য্যাবলী থেকেই বোঝা যায় যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তাতে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার বিরোধী বামপন্থী দলগুলির নির্ব্বাচনে স্বাধীন ভাবে প্রতিদ্বন্দীতায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ কতখানি পাওয়া যাবে! এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের কংগ্রেস ও সরকারের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ঘৃণা ও বিদ্বেষকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতায় লড়বার জন্য সারা ভারত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির গত জুলাই মাসের বর্দ্ধিত অধিবেশনে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার গৃহীত হয়েছে, যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে ও রাজ্য পরিষদগুলিতে দলের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করবেন! এই নির্ব্বাচনী আন্দোলন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটী নির্ব্বাচনী বোর্ড গঠিত হয়েছে।

নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের প্রথমেই জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে ভোট দেবার অধিকার দেশবাসীর একটী মৌলিক অধিকার। কিন্তু বড়লোক কলওয়ালা ও জমিদারের দল জনসাধারণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়—বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষ গরীব চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্তকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। তাই ওদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে সাধারণ গরীব খেটে খাওয়া মানুষকে এই মৌলিক অধিকার রক্ষা ক'রতে হবে, ভোটের সুযোগ নিতে হবে। তা না হ'লে বড়লোক শোষকদের সুবিধা আরও বেড়ে যাবে তাদের ইচ্ছামত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার। প্রত্যেককে সচেতন ও সজাগ থেকে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

নির্ব্বাচনের মূল লক্ষ্য

সম্বন্ধে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নির্ব্বাচনী ইসতেহারে বলা হয়েছে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসণ ব্যবস্থা থাকা কালে দেশের জনসাধারণের সামনে প্রধান সমস্যাই ছিল বিদেশী শাসণ ও শোষণ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা। জনসাধারণ চেয়েছিল শোষণ মূলক সমাজ ব্যবস্থা পালটে ফেলে জনকল্যাণ মূলক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভোগ বিলাসী শোষকের হাত থেকে সমস্ত মানুষকে মুক্ত করা ও মানুষের কল্যাণ ও উন্নতির পথে সমস্ত সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা—এই উদ্দেশ্যেই দেশবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিল। সাদার পরিবর্ত্তে কালোর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন কিংবা শুধু ব্যক্তিগত শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্তন স্বাধীনতা সংগ্রামের কখনই লক্ষ্য ছিল না। মুষ্টিমেয়র হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে দেশবাসী চায় নি। রাজা মহারাজা, জমিদার, কলওয়ালা মালিক ও মুনাফাখোর ধনী ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকার হওয়া এবং এদের স্বার্থেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা দেশবাসী বরদাস্ত করতে তৈরী ছিল না। কিন্তু যে স্বাধীনতা ভারতবর্ষ পেয়েছে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কংগ্রেসের আপোষের ফলে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করেছে, সত্যিকারের স্বাধীনতা আসে নি। সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করার ফলে দেশের উপরে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ আজও অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বৃটিশ কমনওয়েলথের গোলামীর বন্ধনে দেশকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আপোষের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেশ বিভাগ হয়েছে, এক সার্ব্বভৌম গণ-রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে মূল ভূখণ্ডকে কৃত্রিম ভাগে ভাগ করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সাম্রাজ্যবাদ নিজ স্বার্থে এমন ভাবে দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্দ্ধারণ করেছে যাতে উভয়েই অর্থ নৈতিক দিক থেকে স্থায়ী ভাবে দুর্ব্বল থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখাপেক্ষী হয়ে চলে। ধনিক শ্রেণীর ব্যবসাদারী স্বার্থে কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বিভক্ত, দ্বিধা খণ্ডিত দেশে যে রাজত্ব কংগ্রেস কায়েম করেছে তা সম্পূর্ণ ভাবে জনস্বার্থের পরিপন্থী, অর্থ নৈতিক সমতা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। জনসাধারণের হাতে মূল রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে নি, সামাজিক মুক্তি ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা জনসাধারণের জন্যে স্বীকৃত হয় নি। দেশ শুধু পেয়েছে ইংরেজের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একদলীয় শাসন—যে শাসন ইংরেজের আমলের শোষণ মূলক কাঠামোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইংরেজ ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করেছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, শোষণের উদ্দেশ্যে—যা কিছু তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল সবই ঐ স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে। কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়ে সেই ব্যবস্থাই বজায় রেখেছে, কাঠামোর কোন পরিবর্ত্তনই করে নি।

কংগ্রেস রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে যে শাসনতন্ত্র চালু করেছে তাতে শুধু সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড় বড় জমিদার রাজা মহারাজা ও মিল মালিক ব্যবসাদারের মুনাফাখোরী স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে। এমন এক গঠনতন্ত্র (constitution) জনসাধারণের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার জোরে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অল্প কিছু দেশী ও বিদেশী শোষকের শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ, দারিদ্র অশিক্ষা চিরস্থায়ী করা। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা, ভাল ভাবে বাঁচার, শিক্ষার এবং শোষণ থেকে মুক্তির প্রভৃতি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন গ্যারাণ্টিই কংগ্রেসের তৈরি গঠনতন্ত্রে নেই।

নির্ব্বাচনের মূল লক্ষ্য হিসাবে তাই নির্ব্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে দেশের বর্ত্তমান সংকটে জনসাধারণের স্বার্থে এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যে সরকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে সকল প্রকারের আঁতাত ছিন্ন করবে; বৃটিশ কমনওয়েলথের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত ক'রে সত্যিকারের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব অর্জন করবে; ঘনায়মান তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বিশ্ব শান্তি রক্ষার অগ্রসর হ'বে; জনস্বার্থ-পরিপন্থী স্বৈরাচারী রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্ত্তন সাধন করে পুঁজিপতি ও জমিদারের শোষণ মূলক ব্যবস্থা নস্যাৎ করে জনসাধারণের হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করবে, এবং জনস্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্র কাঠামো পরিচালনার উপযোগী গঠনতন্ত্র রচনা করবে।

কায়েমী স্বার্থের অনুচর, পুঁজিপতি জমিদার শ্রেণীর অর্থে পুষ্ট পেটোয়া দলের পরিচালিত সরকার কোনদিনই এই দায়িত্ব পালন করবে না, করতে পারে না। একমাত্র মেহনতি জনগণের খাঁটি প্রতিনিধি গরীব জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাকারী শ্রমিক শ্রেণীর দলই এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। সুতরাং জনস্বার্থ রক্ষাকারী বামপন্থী দলগুলির মনোনীত প্রার্থীরা যাতে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচনে জিততে পারেন সে ব্যবস্থা জনসাধারণকে করতে ইস্তেহারে আবেদন করা হয়েছে।

নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দী বিভিন্ন দল সম্বন্ধে

নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দী বিভিন্ন দল সম্বন্ধে নির্ব্বাচনী ইসতেহারে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের কায়েমী স্বার্থে পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রধান প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। গত বছরের শাসনের কলঙ্কময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এই দল আবার জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার জন্যে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হ'বে। জনসাধারণের প্রথম দায়িত্ব হ'বে এই প্রতিক্রিয়ার দুর্গ কংগ্রেসকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করা, কংগ্রেস প্রার্থীর

চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও ধণিক মালিক শ্রেণী

ইস্তাহারে ঐক্যবদ্ধ সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চার আঘাতে

একটি ভোট ও না দিয়ে ওদের বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া।

ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দল গুলি সম্বন্ধে বিশেষ হুঁসিয়ার দিয়ে ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে, ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত থাকে, শোষণের বখরা নিয়ে পুঁজিপতিদের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ দেখা দেয়। তাই বিভিন্ন ধনিক গোষ্ঠি বিভিন্ন জোট পাকিয়ে, দল বা গ্রুপ করে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ব করতে চায়, কোন বিশেষ ধনিক শ্রেণীর দল পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে অন্য ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা কারী দল বিরোধিতা করে—ইহা ইতিহাসেরই অমোঘ নিয়ম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধরণের অনেক দল বর্ত্তমানে গড়ে উঠেছে। সামন্ততান্ত্রিক রাজা মহা-রাজাদের গোষ্ঠী, বড় বড় জমিদার সম্প্রদায়; বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নেতারা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এই ধরণের দল গঠন করে জন-সাধারণের কংগ্রেস-বিরোধিতার সুযোগ নিতে চায়।

এই সব প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির মধ্যে অন্যতম হিন্দু মহাসভা। এই গোঁড়া সাম্প্রদায়িক দল সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, জমিদার ও কলওয়ালাদের প্রতিভূ হিন্দু মহাসভা জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্র-দায়িকতার বিষ ছড়িয়ে জনতাকে বিভক্ত করতে চায়। হিন্দু মহাসভার মতই সাম্প্র-দায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি পরিচালিত জনসঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠন। এই সব দলের কংগ্রেস বিরোধিতার উদ্দেশ্য আর জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এই সব দলকেও পরাজিত করতে আহ্বান দেওয়া হয়েছে।

আচার্য্য কৃপালনী এবং ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি পরিচালিত প্রজা পার্টি সম্বন্ধে ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের ন্যায় এই দলও জনসাধারণকে ধাপ্পা দেবে, বর্ত্তমান ব্যাবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্ত্তনই এরা করতে পারবে না। কেননা প্রজা-পার্টির নীতিগত ভাবে কংগ্রেসের সাথে কোন বিরোধই নেই। কংগ্রেসী নীতি মানেই—ধনিক তোষণ নীতি, পুঁজিবাদী শোষণ বাঁচিয়ে রাখার নীতি। প্রজা পার্টির নেতারা সবাই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের চাঁই ছিলেন, এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী থাকা কালীন এদের কার্য্য কলাপ অন্যান্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে কোন ব্যাপারেই ভাল ছিল না। আজকে ক্ষমতার কোঁন্দলে পরাজিত হয়ে এঁরা কংগ্রেসের বিরোধি-তার নাম করে জনসাধারণের সামনে এসেছেন। জনসাধরণ এদেরকে চিনতে মোটেই ভুল করবে না।

জয় প্রকাশ কর্তৃক পরিচালিত সমাজ-তন্ত্রী দল সম্বন্ধে ইস্তেহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে পুঁজিবাদের সঙ্কটের দিনে, ধনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তিই হলো এই তথাকথিত সমাজতন্ত্রী দল। কংগ্রেস যত বেশী দুর্ব্বল হচ্ছে, ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দল যত বেশী জনপ্রিয়তা হারাবে, ধনিক শ্রেণী তত বেশী এই সমাজতন্ত্রী দলকে সাহায্য করবে, পুষ্ট করবে যাতে এরা বড় বড় কথার আড়ালে বামপন্থী শিবির থেকে জনসাধারণকে ভাঁওতা দিতে পারে।

এই দলই বর্ত্তমানে ধনিক শ্রেণীর সবচেয়ে কৌশলী দল, এদের সম্বন্ধেই জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে সবচেয়ে বেশী। এদের এই চরিত্র প্রমাণ হয় এদের কার্য্য কলাপ থেকে—এরা বাম-পন্থী ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করেছে, শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, সাম্রাজ্য-বাদের দালালি করে ভারতবর্ষকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের লেজুড়ে পরিণত করতে চাইছে। নির্ব্বাচনী ইস্তেহারে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে এই ধরণের ধনিক শ্রেণীর দল গুলির সাথে কোন রকমের ঐক্য বা মিতালি সম্ভব নয়।

বামপন্থী ঐক্য—

ধনিক শ্রেণীর দল গুলিকে, পুঁজিপতি ও জমিদারদের সক্রিয় সাহায্যে ও অর্থে পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গুলিকে পরাজিত করার জন্য নির্ব্বাচনে সত্যিকারের বামপন্থী ঐক্য প্রয়োজন বলে নির্ব্বাচনী ইসতেহারে ঘোষনা করা হয়েছে। এই বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সমস্ত সত্যিকারের বামপন্থী দলগুলিকে জনতার দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ কর্ম্মসূচীর অধীনে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করতে আহ্বান করেছেন। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস এবং ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দলগুলিকে পরাজিত করার জন্য এই বামপন্থী ঐক্য গড়ার দাবী বিভিন্ন বামপন্থী দলের কাছে করতে হ'বে।

যদি কোনও দল নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দিয়ে আসলে দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট পার্টি, কৃপালনির প্রজা পার্টি কিংবা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির জন-সঙ্ঘ প্রভৃতি ধনিক শ্রেণীর দলের সাথে নির্ব্বাচনী ঐক্য করেন, তবে জনসাধারন সেইরূপ দলকেও বামপন্থী শিবির ত্যাগী দক্ষিণপন্থী বলেই বিবেচনা করবে।

স্থায়ী শান্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ও জন-রাজের জন্য

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে দেশে সত্যিকারের জন রাজ প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে—যার লক্ষ্য হ'বে স্থায়ী বিশ্বশান্তির জন্য সক্রিয় চেষ্টা করা, দেশের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা এবং জনতার মুক্ত সুখী জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।

এই আদর্শকে সফল করার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার নির্ব্বাচনী ইস্তেহারে এক বিস্তৃত কর্ম্মসূচী পেশ করেছেন।

কর্ম্মসূচী :

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গঠন তন্ত্র :—

১। কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ,

২। বর্ত্তমান গঠণতন্ত্র নাকচ এবং পূর্ণবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাদিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নতুন গঠনতন্ত্র রচনা।

৩। আঞ্চালিক গণকমিটির ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জনসাধারণের হাতে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা দান।

৪। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পরিষদ হ'তে সরিয়ে আনার ক্ষমতা ভোটারের থাকবে।

৫। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন।

৬। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী বিলোপ ও গণফৌজ গঠন।

৭। আমলাতন্ত্রের বিলোপ এবং শাসনব্যবস্থা হ'তে প্রতিক্রিয়াশীলদের অপসারণ।

৮। জনগণের পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

বৈদেশিক নীতি :—

৯। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ।

১০। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের সঙ্গে আঁতাত ছেদ।

১১। পৃথিবীর শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিকামী শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠণ।

১২। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ন্যায়, সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

১৩। কাশ্মীর হ'তে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ অপসারণ এবং কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান।

১৪। ভারত পাক সমস্যার শান্তিপুর্ণ সমাধান।

অর্থ নৈতিক নীতি :—

১৫। দেশের জনস্বার্থের অনুকুলে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতি চালু।

১৬। জিনিষপত্রের দাম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা।

১৭। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য দেশের মুদ্রানীতির আমূল সংশোধন।

১৮। বড় বড় ধনী ও ব্যবসায়ীদের কালবাজারেও অসদোপায়ে অর্জিত টাকা বাজেয়াপ্ত।

১৯। ফাঁকি দেওয়া আয়কর অবিলম্বে বড় বড় শিল্পপতিদের কাছ হ'তে উদ্ধার।

২০। বড় বড় শিল্পপতিদের উপর আয়কর, সুপারট্যাক্স ও অধিক লাভকরের হার বৃদ্ধি।

২১। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার ও বৃদ্ধি।

২২। জনতার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ট্যাক্স হ'তে রেহাই।

২৩। বৃটেনের কাছে গচ্ছিত পাওনা ষ্টার্লিং অবিলম্বে উদ্ধার।

কৃষি নীতি

২৪। বিনা খেসারতে জমীদারী ও সেই জাতীয় প্রথার বিলোপ এবং চাষীর হাতে জমি বিলি।

২৬। রাজা মহারাজার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

২৬। চাষীর অতীতের ঋন মকুব।

২৭। বিনা বা নামমাত্র সুদে কৃষি ঋন দান।

(৮ পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

ও অন্যান্য দলের জন-বিরোধী ষড়যন্ত্র নাশের আহ্বান

১৫ই আগষ্টের কলঙ্কিত ইতিহাস

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

থামিয়ে দিয়েছে। এমনকি আগষ্ট আন্দোলনকেও সংহিস আন্দোলন আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করেছিল এই নেতৃত্ব। অর্থাৎ তারা বুঝেছিল ভারতের জনসাধারণ যদি বিপ্লবের মারফৎ ক্ষমতা দখল করে তবে সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে ভারতের পুঁজিবাদকে কায়েম হয়ে বসার সুবিধাও তারা দেবে না। তাই বার বার এই দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আপোষ আলোচনার পথে স্বাধীনতা মানে তাদের অবাধে শোষণ করার স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করেছে এবং জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পরিশেষে তারা বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের অসন্তোষ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। কলে কারখানায় অফিসে ধর্মঘটের বন্যা বয়ে চলেছে, মাঠে মাঠে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে; সহরে রাস্তায় রাস্তায়, স্কুলে কলেজে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বৃটীশ শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রত্যেকেই সংগ্রাম করে চলেছে। এমনকি সৈন্যদলের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল একটা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিল। এই অবস্থায় বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ দেখলো যে শুধু গুলির জোরে ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে দমানো যাবে না সুতরাং সে অন্যপথ গ্রহণ করলো। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ পরিস্কারভাবে বুঝেছিল যে ভারতের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্তের এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনের ভয়ে শুধু তারাই ভীত নয় ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীও এই আন্দোলনকে ভয় করে। ভারতের বুর্জোয়ারা জানে এই আন্দোলন বাড়তে দিলে বৃটীশ শাসন চলে যাওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা আসবে জনসাধারণের হাতে—যারা নাকি সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের সংগে সংগে পুঁজিবাদের গায়েও হাত দেবে। তাই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ আপোষ আলোচনার জন্য তার স্বগোত্র কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব ও ভারতের মুস্লিম্ পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি মুস্লিম লীগকে ডাক দিল। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝল যদি আপোষের মারফৎ কিছুটা শাসন ক্ষমতা দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে দেওয়া যায় তবে তাদের শোষণ করার অধিকারের কোনই ক্ষতি হবে না। তাই দেখা গেল "মাউন্ট ব্যাটেন রোয়েদাদে" ভারত হয়ে গেল বিভক্ত "ভারত ডোমিনিয়ন" ও "পাকিস্তান"। আপোষের মারফৎ নাকি স্বাধীনতা এসে গেল। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আগের মত টিক রইল কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব ভারতীয় জনসাধারণের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণ কি পেয়েছে? বৃহৎ নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দলে দলে লোক প্রান দিল ঘরবাড়ী হারিয়ে বাস্তহারা হতে বাধ্য হ'লো। দিনের পর দিন দুই রাষ্ট্রের বিস্মিত জনতা বুঝতে পারছে যে এতদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যা তারা চেয়েছিল তা আসেনি। এসেছে পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণের স্বাধীনতা আর গরীব জনতার না খেয়ে মরার স্বাধীনতা। এই চার বছরের ইতিহাস তাই চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাকতার ইতিহাস। পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতা কায়েম করার পর জঘন্যভাবে গরীব জনতার উপর চলেছে আক্রমণ। ট্যাক্সের বোঝা বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর, ভাত কাপড়ের মূল্য দিনের পর দিন কেনার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, চোরাকারবার সমাজের ভিত্তি মূলকে নাড়া দিচ্ছে, বাঁচার জন্যও ধর্মঘট বেআইনী, ছাঁটাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; বেকার ঘরে ঘরে; অনশন দুর্ভিক্ষ গ্রামে গ্রামে। চাষীদের নিজের তৈরী ধানে তাদের কোনই অধিকার নেই। কথায় কথায় গুলি চলে, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, বিনা বিচারে হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী আটক রয়েছে। "জমিদারী প্রথা" কৃষক শ্রেণীকে ভিখারীতে পরিণত করেছে অথচ তা উচ্ছেদ করা হবে না। প্রায় ১৫০০ কোটী টাকা বিদেশী মূলধন এখনও ভারতে খাটছে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে না—নতুন ভাবে বিদেশী মূলধন খাটাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। দেশী বড় পুঁজিপতিরা মুনাফার পাহাড় করে চলেছে তাকে রোধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে গরীব জনতা নিরন্ন, বুভুক্ষু, বাস্তহারা, শিক্ষা নেই। তাদের খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থাই হবে না। অর্থাৎ সেই পুরোনো বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো আজও টিকে আছে।

এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে একমাত্র সামাজিক বিপ্লব ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" মাঝ পথে থেমে গিয়েছে তাকে সফল করতে হলে মজুর শ্রেণীকে কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তকে সংগে নিয়ে তা সফল করতে হবে। পুঁজিপতি শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি তাহারা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীতা করে না।

আজও বিদেশী মূলধন ও সামন্ততন্ত্র ভারতের বুকে চেপে রয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো অবিলম্বে প্রয়োজন। দেশে যাতে শিল্পে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রচেষ্টা থাকা দরকার।

কিন্তু কংগ্রেসী বা লীগ সরকার তা কোনদিন করবে না কেননা তারা নিজেদের স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। একে সফল করতে হলে ধনিক শ্রেণীকে জনতাচ্যুত করতে হবে—এবং তা একমাত্র জন সাধারণের রাষ্ট্রই করতে পারে সুতরাং মজুর চাষী নিম্ন মধ্যবিত্তকে আজ সুসংগঠিতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে চালাতে হবে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে নাকি আর কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে! গড়ে তুলতে হবে বামপন্থী ঐক্য। একমাত্র এইভাবে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দেওয়া যাবে, দেশে সুখী শান্তিপূর্ণ সমাজ বাড়ার সম্ভাবনা গোড়ে যাবে।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

গণদাবীর পাঠক ও দরদী জনসাধারণের প্রতি

দীর্ঘ দিন পরে "গণদাবী" প্রকাশ করার জন্য সর্ব প্রথমই পরিচালক মণ্ডলীর তরফ হতে আন্তরিক ত্রুটী স্বীকার করছি। একান্ত অনিচ্ছা সত্যেও কি করে এ ধরণের ত্রুটী হওয়া সম্ভব তা আশাকরি গণদাবীর পাঠক ও দরদীদের বুঝতে কষ্ট হবে না। ওয়াকিবহাল পাঠক মণ্ডলী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সম্প্রতি বড় বড় কাগজ ওয়ালা বা কাগজের কলওয়ালারা বিশেষতঃ মার্কিণ একচেটীয়া কাগজ ওয়ালাদের অতি মুনাফা শীকার ও যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য কাগজ, গুদামজাত করে রাখায় কাগজের বাজার অনেকেরই নাগালের বাইরে চলে যায়।

জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিচার করে অগ্নিমূল্যে কাগজ কিনে দাম মিটানোর জন্য পাঠকদের উপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়ার কথা বিবেচনা করেই এযাবৎ 'গণদাবী'র প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়।

● মেহন্নতী জনতার মুখপত্র 'গণদাবী' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন।

● গণদাবী নিয়মিত পাঠ করুণ ও অন্যকে পাঠক তালিকা ভুক্ত করুণ

● প্রতিদিনকার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিমাসে আপনার যথাসাদ্ধ সাহায্য 'গণদাবী তহবিলে' পাঠান।

সুখের বিষয় যে, গত ২৯শে জুলাই "গণদাবী" চতুর্থ বার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'গণদাবী' পাঠক ও দরদীদের নিয়ে পরিচালক মণ্ডলী **১৫ই আগষ্টের প্রতিবাদ দিবসে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।**

'গণদাবী' নিয়মিত প্রকাশের জন্য এবং বিশেষভাবে পাঠকদের উপর যাতে চাপ না পরে তা বিবেচনা করেই 'গণদাবী'র দাম আগের মতই প্রতি সংখ্যা দুই আনা রাখা হয়েছে। কিন্তু চড়া দামে কাগজ কিনে বর্তমান হার ঠিক রেখে নিয়মিত ভাবে গণদাবী প্রকাশ করার জন্য একটি **"গণদাবী তহবিল"** ৪৮নং ধর্মতলা, কলিঃ-১৩ গণদাবী ম্যানেজার এই ঠিকানায় খোলা হয়েছে। মুক্ত হস্তে "গণদাবী তহবিলে" সাহায্য করুণ :—

● দেশী ও বিদেশী ধনিক, মালিক, জমিদার মহাজনদের মিলিত আক্রমনের বিরুদ্ধে গণদাবী প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নিন।

● গণদাবী জনসাধারণের সাহায্যের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল তাই জনতার অংশ হিসাবে আপনার কর্ত্তব্য "গণদাবী তহবিল"কে শক্তি শালী করা।

বিনীত—

গণদাবী ম্যানেজার

★ সমানাধিকারের একসূত্রে বাঁধা ★

পুঁজিবাদের অত্যাচার, জাতীয় বিসংবাদ, নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট ও বেকার সমস্যার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হয়ে চেক ও স্লোভাক জাতি বিপুল উৎসাহে তাদের নতুন জীবন গড়ে তুলছে। তাদের ইতিহাসে এই প্রথম দুই স্লাভ ভ্রাতৃ-প্রতিম জাতি সম্পূর্ণ সমানাধিকারের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এই সমানাধিকার চেকোস্লোভাক গণতন্ত্রের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি। লাল ফৌজের সাহায্যে ফাসিজমের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে দেশে জনগণের সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

অতীতে চেকোস্লোভকিয়া যখন অস্ট্রো-হাঙ্গারীর একটি অংশ ছিল, তখন অষ্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান বুর্জোয়া শ্রেণী চেক ও স্লোভাক উভয় জাতির উপর সমভাবে অত্যাচার চালাতেন। স্লাভদের তারা মনে করতেন "নিকৃষ্ট" জাতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় সমস্যার কোনো সমাধান হওয়া সম্ভব ছিল না।

যুগের পর যুগ ধরে চেক বুর্জোয়ারা স্লোভাকবিরোধী মনোভাব উস্কে তুলে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করা তথা নিজেদের শাসন কায়েম রাখার চেষ্টা করেছেন। স্লোভাক বুর্জোয়ারাও চেক-বিরোধী ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে স্লোভাকদের মনে বিদ্বেষের বীজ বপন করলেন। উভয়ের এই মারাত্মক নীতির ফলে রাষ্ট্রের সংহতি হল দুর্বল এবং শাসক শ্রেণী উভয় জাতিকেই শোষণ করার আরো বেশী সুযোগ সুবিধা পেলেন।

ফাসিজমের কবল থেকে মুক্ত হয়ে চেকোস্লোভাকিয়া যখন পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ সাধন করল, একমাত্র তখনই জাতিগত সমস্যার হল সুষ্ঠু সমাধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলার স্লোভাকিয়াকে এক "স্বাধীন" রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফাসীজমের পতনের পরে স্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রে যোগ দিল অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে, যোগ দিল চেক ভাইদের সঙ্গে। প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে: "চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্র দুটি সমান স্লাভ জাতির এক অখণ্ড রাষ্ট্র চেক ও স্লোভাক এই দুই জাতির।"

সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের স্লোভাক অংশের জাতীয় উন্নয়নের এমন সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা পূর্বে কেউ আশা করতেও পারতেন না। নিখিল প্রজাতন্ত্র শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্লোভাক শাসনযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্লোভাক ভূমিতে এই সব শাসনযন্ত্রের হাতে শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। নিখিল প্রজাতন্ত্র শাসনযন্ত্রের মতো জাতীয় স্লোভাক শাসনযন্ত্রগুলিতেও (স্লোভাক জাতীয় পরিষদ ও স্থানীয় কমিটিগুলিতে) চেক ও স্লোভাকদের অধিকার সমান।

যুদ্ধ পূর্ব চেকোস্লোভাকিয়ার বৈষম্য দেখা যেত এই কারণেই যে, দেশের অবশিষ্ট অংশের তুলনায় স্লোভাকিয়া ছিল আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত ও অনগ্রসর। স্লোভাকিয়াকে কৃষি প্রধান আধা-উপনীবেশ করে রাখার জন্যে চেক বুর্জোয়াদের অপচেষ্টার অন্ত ছিল না। গণতন্ত্রের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ স্লোভাকিয়ায়। এই স্লোভাকিয়ায় কোনো আধুনিক শ্রমশীল্প ছিল না। কৃষিকার্যও ছিল মান্ধাতার আমলের দু চারটে স্লোভাক কারখানা যাও, বা ছিল তাতেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না

৫০ টি সুবৃহৎ কারখানা তৈরী হয়েছে। তন্মধ্যে ২০ টির কাজ সুরু হয়েছে গত বছরে।

স্লোভাকিয়ার শিল্পোন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধানলক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে গুরু শিল্পের দ্রুত প্রসার বৃদ্ধি। বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে খনিজ, বিজলী, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের দিকে। পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে এই সব শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধের আগের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি দাঁড়াবে। ১৯৫৩ সালে একা স্লোভাকিয়া যুদ্ধ-পূর্ব গোটা চেকোস্লোভাকিয়ার সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করবে।

স্লোভাকিয়ার জাতীয় শিল্পের অপরিসীম প্রসারের ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে; বিভিন্ন শিল্পে লোক জন প্রয়োজন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াবার জন্যে সর্ব্বত্র কারখানা সংলগ্ন ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বিশেষ করে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের অগ্রগতির ফলে কৃষিকে যন্ত্রসজ্জিত করা ও কৃষকদের কায়িক শ্রম লাঘব করার পথ প্রশস্ত হয়েছে। চেকো-

পুঁজিপতি ও জমিদারদের সম্পত্তি সে সব এখন শ্রমজীবী জনগণের বিশ্রামভবন ও স্বাস্থ্যাবাস। গত বছর প্রায় ৫ লক্ষ চেক ও স্লোভাক বিভিন্ন স্বাস্থ্যভবনে তাঁদের ছুটি কাটিয়ে এসেছেন। প্রজাতন্ত্রের বাছা বাছা সুরম্য স্থানে অবস্থিত গ্রীষ্মকালীন শিবিরে লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতি বছর তাদের বার্ষিক ছুটি কাটায়।

স্লোভাকিয়া দ্রুত পদে দেশের অবশিষ্ট অংশের নাগাল ধরছে। স্লোভাকিয়া আজ চেকোস্লোভাকিয়ার এক উন্নত ও অগ্রগামী অংশে পরিবর্ত্তিত হতে চলেছে।

চেক ও স্লোভাক জাতি তাদের সৌভ্রাত্রমূলক কমনওয়েলথের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে তাদের নব জীবন গড়ে তুলছে।

—টাস

ডি, বোচারফ

না ছিল তার প্রসার বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা। বেকারের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলত। পেটের তাড়নায় হাজার হাজার স্লোভাক বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হতেন। স্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ছিল দেশের চেক অধ্যুষিত অংশের চেয়ে অনেক নিচে।

জনগণের হাতে ক্ষমতা আসার পর এই অবিচার লুপ্ত হল। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে গতওয়াল্ড বলেছেন, "আমাদের দেশে চেক অঞ্চল ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া সমাজতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্যই শুধু নয়, সমাজতন্ত্রের জয়লাভের অপরিহার্য্য ভিত্তি ভূমিও বটে।"

দেশের অর্থনৈতিক অভ্যুন্নতির জন্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ও লোকায়ত্ত সরকার তাদের কর্ম্মসূচীতে স্লোভাকিয়ার শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নকে মস্ত বড় স্থান দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই দ্বিবার্ষিকী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পানার সফল সম্পাদনের ফলে স্লোভাকিয়ার শ্রমশিল্পজাত পন্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৩৭ সালের দ্বিগুণ। পরে স্লোভাকিয়ার শ্রম শিল্পের আরো বেশী উন্নতি হয়েছে। গত ৫ বছরে স্লোভাকিয়ায় স্লোভাকিয়া আজ প্রতি বছরে যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে গঠিত চাষী সমবায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

জাতীয় অর্থনীতির সফল অগ্রগতির কল্যাণে শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মান বেড়ে গিয়েছে। একমাত্র গত বছরেই চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রে কলকারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৬ ভাগ এবং কৃষকদের আয় বেড়েছে শতকরা ১৯ ভাগ।

চেক অঞ্চলের তুলনায় স্লোভাক অঞ্চলের যে সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা রয়েছে তা ঘুচিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লোকাত্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্লোভাকিয়াতে শত শত স্কুল, থিয়েটার, ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে ছিল মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেক্ষেত্রে আজ ৭টি উচ্চ শিক্ষায়তন আছে। তদুর্দ্ধে আছে একটি আর্ট স্কুল ও কৃষি কলেজ।

লোকায়ত্ত সরকার প্রতিবৎসর অসংখ্য বাড়ী ঘর তৈরী করাচ্ছেন। গড়ে উঠছে হাসপাতাল, পলিক্লিনিক ও ঔষধালয়ের দেশব্যাপী বেড়াজাল। আগে যে সব ভালো ভালো বাসভবন ও প্রাসাদ ছিল

বিপুল উদ্দীপণার সাথে কলিকাতার যুব উৎসবে বিশ্বশান্তির সপথ

বার্লিনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব যুব উৎসবের সম্মানার্থে গত ৫ই আগষ্ট বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ক্রীড়ামোদীদের দ্বারা গঠিত "প্রস্তুতি কমিটির" উদ্যোগে বিশ্ব শান্তির জন্য ছাত্র ও যুব উৎসব পালন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে চালিত বিশ্ব যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সৃষ্টির পক্ষে ধ্বংসের বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুব সমাজের শক্তির সংহত রূপ দেওয়াই ছিল এই উৎসবের বৈশিষ্ট ও লক্ষ্য। দক্ষিণ কলিকাতার হাজরা পার্ক এবং উত্তর কলিকাতার হেদুয়া হইতে দুইটি বিরাট সুসজ্জিত মিছিল আসিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়। সেখানে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। সভায় প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক উৎপল দত্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কমরেড প্রীতিশ চন্দ বিশ্ব যুব উৎসবকে অভিনন্দন জানাইয়া, সরকারের ছাড় পত্রনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া ও কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব শান্তির জন্য যুব শক্তিকে সংহত হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে আহ্বান জানান, সভায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্কেণ্ডেয় ঝা প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন। সভার শেষে এক বিরাট মশাল মিছিল উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

★ গণদাবী প্রতিষ্ঠার লৌহ দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ ★

চতুর্থ বার্ষিকী গণদাবী দিবসের জনসভা

গত ৩০শে জুলাই সোমবার বিকেল ৫॥০ টায় হাজরা পার্কে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র 'গণদাবীর' চতুর্থ বার্ষিকী দিবস বিপুল সমারোহে ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত গণদাবী পাঠকদের অভিনন্দন বাণী পঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণদাবীর প্রধান সম্পাদক শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী। অন্য একটি জরুরী সভার কাজে ব্যস্ত থাকায় সভাপতি শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী প্রথমেই তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাহার স্বভাব সুলভ কৌতুক মিশ্রিত বাক্যবাণে এই কংগ্রেসী সরকারের স্বরূপ, এবং গণদাবী জনসাধারণের মুখপত্র হিসাবে সরকারের প্রতিটি নীতিকে কিভাবে বিশ্লেষণ ক'রে শোষিত শ্রেণীর স্বার্থকে বহন করিয়া চলিয়াছে, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জনসাধারণকে সাবধান করিয়া বলেন যে আসন্ন নির্ব্বাচনের উপর জনসাধারণের সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবেনা। জনসাধারণের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে এই কংগ্রেসী সরকারের শ্রেণী চরিত্র বুঝাইয়া বিপ্লবের মারফৎ এই রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংস করিয়া শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েম করার মধ্যমেই তাহা সম্ভব হইবে।

নির্ব্বাচনে শোষিত শ্রেণীর সত্যিকারের প্রতিনিধিদের জয় লাভ এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। 'গণদাবী' জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার সার্থক পরিপূর্ণ কারতে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। দরদী জনসাধারণ গণদাবীর চলার পথকে প্রশস্ত করিয়া তুলুন। কমরেড ব্যানার্জী 'গণদাবীর' অন্যতম সম্পাদক ও বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড প্রীতীশ চন্দের উপর সভার কার্য্য পরিচালনার ভার দিয়া বিদায় লন। এর পর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারে সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের মুখপত্র 'গণদাবীর' অভ্যুত্থান হয় ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাইয়ে যখন গণ আন্দোলনের ঢেউ ভারত বর্ষের সমস্ত প্রান্তে প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং যখন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং দলের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়িয়াছিল তখন "গণদাবী" তা'র সামান্যতম সামর্থ্য লইয়া জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হইয়াছিল। আজ 'গণদাবী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের পুঁজীবাদী সরকারের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছে। 'গণদাবী' তার প্রতিটি সংগ্রামের মধ্য দিয়া এই সরকারের নির্লজ্জ স্বরূপ— শোষণ-চোরাকারবার ও মুনাফাবাজীর আসল চেহারা প্রকাশ করিয়াছে। "গণদাবী" দ্বীধাহীন ভাবে বলিয়াছে, সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা এই পুঁজীবাদী সরকারকে উচ্ছেদ না করিয়া জনসাধারণের রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব নয়।

সর্ব্বশেষে কমরেড প্রীতীশ চন্দ বলেন, 'গণদাবী' জনসাধারণের মুখপত্র। জনসাধারণের কর্ত্তব্য গণদাবীকে বাঁচাইয়া রাখা, যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে গণদাবীকে অগ্রসর হইতে হইতেছে তাহাতে জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতির উপরেই গণদাবীর প্রকাশ ও প্রসার একান্তভাবে নির্ভরশীল। ভাবী বিপ্লবকে সফল করিতে গণদাবীর প্রতি আরও অধিক পরিমাণে সক্রিয় সহানুভূতি লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে।

বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে অতঃপর সভার কার্য্য শেষ হয়।

হাওড়ায় "গণদাবী দিবস" উদ্‌যাপিত

২৯শে জুলাই সকাল ৮ টায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হাওড়া জেলা শাখার অফিসে এস. ইউ. সি, র বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'র পাঠক ও দরদীদের এক সভা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড নারায়ণ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্য কমরেড নীহার মুখার্জি প্রধান বক্তা হিসাবে "গণদাবী"র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণের রুটী রুজী, গণতান্ত্রিক ও শান্তি আন্দোলনে 'গণদাবী'র বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করেন।

সভায় ছাত্রনেতা কমরেড শংকর রায় চৌধুরী, মজদুর নেতা কমরেড শচীন রায় প্রভৃতি গণদাবীর বৈপ্লবিক আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর উপরে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি কমরেড নারায়ণ দাস বক্তৃতা প্রসংগে গনদাবীর আদর্শের প্রতি পাঠকদের অনুপ্রাণিত হইতে এবং গণদাবীর বহুল প্রসারের মারফৎ জনগণের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবী প্রতিষ্ঠায় আগাইয়া আসিতে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান।

শোষিত মেহনতী জনতার বিভিন্ন দাবীর আওয়াজ, বিশেষ করে গনদাবীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে সভা শেষ হয়।

এস, ইউ সি'র নির্ব্বাচনী ইস্তাহার

(৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

২৮। বর্ত্তমান চড়া খাজনার হার হ্রাস।

২৯। স্লোথ ও সম.. প্রথায় বৈজ্ঞানিক চাষ বাসের প্রচলন।

৩০। চাষীর জমি যাতে হাতছাড়া না হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কৃষি আইন প্রণয়ন।

৩১। ক্ষেত মজুরদের উপযুক্ত মজুরী ও কাজের সময় নির্দিষ্ট করা।

৩২। বেগার প্রথার বিলোপ।

৩৩। পশুচারণ ও বন হ'তে কাঠ সংগ্রেহের অধিকার স্বীকার।

শিল্প নীতি

৩৪। সমস্ত বিদেশী শিল্প বাজেয়াপ্ত।

৩৫। ইস্পাত লোহা, শক্তি, খনি, যানবাহন, রাসায়নিকসার, চা-বাগান, পাট, বস্ত্র, শর্করা এবং ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স শিল্পগুলির জাতীয় করণ।

৩৬। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত ছোটখাট শিল্পগুলিকে সাহায্য দান ও তদ্বির করা যাতে সেগুলি দেশের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করে।

৩৭। জাতীয় শিল্পের দ্রুত বিস্তারের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা।

৩৮। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের কার্য্যকরী অধিকার স্বীকার।

শ্রম নীতি

৩৯। মূল্যমান অনুযায়ী মজুরী স্থির করা।

৪০। ধর্ম্মঘটের অধিকার স্বীকার।

৪১। সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা হিসাবে কাজের সময় স্থির।

খাদ্য নীতি

৪২। দেশকে ৫ বছরের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী করা।

৪৩। জলসেচের ব্যবস্থা উন্নত করা।

৪৪। অনাবাদী পতিত জমি চাষের অধীনে আনা।

৪৫। অন্যান্য জিনিষ পত্রের দাম অনুযায়ী ফসলের দাম নির্দ্ধারণ।

৪৬। বলপূর্ব্বক সংগ্রহ নীতির পরিবর্ত্তে চাষীর ইচ্ছামত বিক্রয়ের অধিকার স্বীকার।

৪৭। গরীব জনতার নেতৃত্বে খাদ্য কমিটি, কনজিউমারস সোসাইটি প্রভৃতি গঠন ও পরিচালনা।

অন্যান্য নীতি

৪৮। কর্মক্ষম লোককে চাকুরী বা বেকার ভাতার ব্যবস্থা।

৪৯। শ্রমজীবি জনতার বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ।

৫০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন।

৫১। বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

৫২। সামাজিক ইন্‌সিওরেন্স ব্যবস্থা চালু।

৫৩। শ্রমজীবি জনতার বাসস্থানের ব্যবস্থা।

৫৪। সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৫৫। উদ্বাস্তুদের ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে স্বীকার।

৫৬। উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ পেশা অনুযায়ী পুনর্বাসন।

৫৭। সমাজ বিরোধী কাজের জন্য কঠোর সাজা।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন, হইতে মুদ্রিত ও ২৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।